ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 242-250
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.455

মুকুন্দরাম থেকে মহাশ্বেতা: শবর জীবনের প্রান্তিকতা ও অস্তিত্বের লড়াই

ড. সারমিন সুলতান, *স্বাধীন গবেষক, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.03.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Mahasweta Devi's novel 'Byadhkhanda' can be regarded as a modern and historical reinterpretation of Mukundaram Chakrabarti's 'Abhayamangal'. In this reinterpretation, Mahasweta Devi relocates the narrative from the realm of divine mythology to the lived history of the marginalized people of the land. According to her perspective, the hunters or the Shabars are the true bearers of history, whose voices Mukundaram Chakrabarti narrated under the overarching framework of the divine glory of the goddess Chandi. In Mukundaram's text, the miraculous power of the goddess Chandi and the royal success of the hunter-king Kalaketu occupy the central position. Mahasweta Devi, however, shifts the focus toward the lived experiences of the Shabar community—their folk life, forest culture, and the tragic consequences they face with the encroachment of modern civilization. While the image of the hunter's life in Mukundaram Chakrabarti's 'Abhayamangal' is shaped within the framework of divine intervention, Mahasweta Devi liberates that image from its supernatural aura and re-establishes it within the domain of historical reality. In Mahasweta Devi's reinterpretation, the characters Kalya and Phuli emerge as representatives of a deprived and exploited tribal society. Their life narratives, which remain only as faint traces or "frames of the past" in Mukundaram's narrative, are brought to the forefront in her work. The creative background of Mukundaram's composition thus conceals within the folds of history the suppressed narrative of an oppressed community, transforming it into a profound artistic tension.Therefore, Mahasweta Devi's Byadhkhanda is not merely a narrative of divine glory; rather, it unfolds as a poignant expression of the silent suffering, protest, and lived realities of the marginalized Shabar community.

Keywords: Forest, Fearless, City, Displacement, Reconstruction

বাংলা সাহিত্যে শোষিত গণমানুষের কণ্ঠস্বর, স্বতন্ত্র্য ধারার লেখক, মানবাধিকারকর্মী ও আদিবাসী অধিকার আন্দোলনকর্মী মহাশ্বেতা দেবী (১৪ জানুয়ারি ১৯২৬–২৮ জুলাই ২০১৬)। বাংলা সাহিত্যে তিনি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করেছেন বিষয়ের বহুমাত্রিকতা এবং দেশজ আখ্যানের অনুসন্ধান করে। সভ্যজনের চোখের অন্ধকারে মিশে থাকা অধিকারহীন আরণ্যক মানুষদের জীবনাচার, ধর্মাচার, লোকাচার, রাজনীতি, অর্থনীতি, লড়াই-সংগ্রাম, তথা অন্দরমহলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের খুঁজে ফেরা আখ্যানে তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন ব্যতিক্রমী জনপদের সাহিত্য। আধিপত্য বিস্তারকারী হেজিমনি (hegemonic) শ্রেণির নয় বরং শোষিত দরিদ্র প্রান্তিক

জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিকে সঙ্গী করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে তুলে এনেছেন মূলস্রোতের সাহিত্যের পাতায়- যে সাহিত্য কেবল মাত্র সাহিত্য হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে শোষক-শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মুক্তির ইশতেহার! নিজের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> "লেখায় আমি আপাত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায়, বিচার করায়, সময়কে দলিলীকরণে বিশ্বাস করি। কেননা একমাত্র সেভাবেই, আমার মতে, উত্তরণ সম্ভব বৃহত্তর আরও মুক্ত ও সচ্ছন্দ কোনো আকাশে। আমি বিশ্বাস করি গণ ও সমাজজীবন আশ্রিত ইতিহাস চর্যায়। ইতিহাসচর্যা, আমার মতে সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে আবশ্যিক।"[১]

বস্তুত মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে আদিবাসী জীবন শুধু বিষয়বস্তু নয়, বরং তা শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ের এক আপসহীন আখ্যান।

শবর জনগোষ্ঠী ভারতের অন্যতম প্রাচীন আদিবাসী সম্প্রদায়। তাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস মূলত পুরাণ, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব এবং লোককথার সমন্বয়ে গঠিত। মেজর জেনারেল স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম-এর মতে, 'শবর' কথাটির উৎপত্তি 'সগর' শব্দ থেকে। স্কাইথিয়ান ভাষায় 'সগর' শব্দটির অর্থ 'কুঠার'। বোঝাই যাচ্ছে, শবরেরা বনে জঙ্গলে কুঠার নিয়ে ঘুরে ঘুরে পশু-পাখি শিকার করতো বলে তাদের এই নাম হয়েছে। বর্তমানে শবরদের অবস্থা যা-ই হোক না কেন, শবরদের অতীত ইতিহাস অনেক গৌরবময়। প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারত, রামায়ণ, 'স্কন্দপুরাণ'-এর কাশীখণ্ড, দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', কবি বাকপতির 'গৌড়বাহ' এবং বাংলা ভাষার আদি গ্রন্থ চর্যাপদেও শবরদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২৮ নম্বর চর্যায় শবর শবরীর জীবন চিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় —

> "উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই শবরী বালী।
> মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ শবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।"[২]

- সাহিত্য ও লোককথা ছাড়াও ধর্মচর্চাতেও শবররা মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। বলা হয়ে থাকে, পুরীর জগন্নাথ নাকি এই শবরদেরই দেবতা এবং কোনো এক জনৈক ব্রাহ্মণ তা চুরি করছিলো বলে তাদের কাছে ব্রাহ্মণ প্রণাম অযোগ্য। ১৯৮৬ সালে বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙালী সভ্যতা কতো প্রাচীন' শিরোনামে শবরদের উৎপত্তি ও উন্নত সভ্যতার কথা বলা হয়েছে—

> "বাংলার আদিম অধিবাসী অস্ট্রিক ভাষাভাষি আদি অস্ট্রালদের বংশধর হচ্ছে সাঁওতাল, লোধা, হো, জুয়াং, শবর, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতি সমূহ। প্রাচীনকালে যে এখনকার মত নিম্নমানের ছিল, তা নয়। প্রাচীনকালে এই সভ্যতা বা এদের সভ্যতা এত প্রভাবশালী ছিল যে আজকের দিনেও ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দুর্গাপুজোর সহিত সংশ্লিষ্ট নব পত্রিকার পূজা, চড়ক গাজন, লক্ষ্মীপূজার ঝাঁপি, বৃক্ষপূজা, বৃষকাষ্ঠ, আনুষ্ঠানিক কর্মে কলা, হরিদ্রা, সুপারি, পান, সিন্দুর, ঘট, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, আলপনা, গোময় প্রভৃতির ব্যবহার অস্ট্রিক ভাষাভাষি গোষ্ঠী তথা শবর সংস্কৃতির দান।"[৩]

শবরদের স্থান যে উঁচুতে ছিলো মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'ব্যাধখণ্ড' (১৯৯৪) উপন্যসের ভূমিকাংশে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন—

> "জগন্নাথ মন্দিরে শবর সম্ভবত প্রথম পূজা করে। আর লোধাশবরের সেদিনের সমাজে স্থান উঁচুতে ছিল বোঝা যায়, কানাইসর পাহাড়ে (১৯৮২ অবধি) লোধা পূজারী উপরে বসতেন, তাঁর নিচে ব্রাহ্মণ। আর বম্বে রোডে গুপ্তমনি মন্দিরে বড়াম মায়ের পুজারী এক লোধা পুরোহিত বংশ। একদা ওই অরণ্যভূমে লোধা শবরের জায়গা সম্মানিতই ছিল।"[৪]

বর্তমানে শবর জনজাতির উপস্থিতি মূলত পূর্ব ও মধ্য ভারতে—বিশেষ করে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড় অঞ্চলে দেখা যায়। পুরাণ, ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক সূত্রে তাদের উপস্থিতি সুস্পষ্ট হলেও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তারা দীর্ঘকাল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতার শিকার। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনামলে প্রথম শবরদের জাতিগত অস্তিত্বে আঘাত আসে। বন থেকে বিভিন্ন আদিবাসী ও নৃ-গোষ্ঠীদের উচ্ছেদ করতে থাকে ইংরেজরা। অরণ্যের গভীরে বাস করা শবররা তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে। কেউ বেছে নেয় যাযাবর জীবন। অভাব-অনটন আর কাজের অভাবে অনেকেই বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ ইংরেজরা ১৯১৬ সালে 'Criminal Tribes Act' (১৮৭১) এর অধীনে তাদের 'অপরাধী উপজাতি' হিসেবে চিহ্নিত করে, যার সামাজিক কুপ্রভাব আজও বিদ্যমান। মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে ইতিহাস ও মিথের আশ্রয়ে শবরদের এই ট্র্যাজেডি ফুটে উঠেছে— যাদের শিকার করা ছিল জীবনধারণের প্রধান উপায়, আইন তাদের 'চোর' বা 'দস্যু' হিসেবে চিহ্নিত করল। অরণ্য যা ছিল তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি, তা হয়ে গেল সরকারি সম্পত্তি; আর সেই বনে প্রবেশ করা শবররা হয়ে গেল 'অনুপ্রবেশকারী'। এই আইনি জটিলতা শবর জাতির অস্তিত্বকে এক দীর্ঘস্থায়ী সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্প-উপন্যাসে শবর, মুণ্ডা, সাঁওতাল ও কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনের অন্ধকার দিকগুলো উন্মোচন করেছেন। তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনে বারবার 'অপরাধপ্রবণ জাতি' হিসেবে চিহ্নিত প্রান্তিক শবর গোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে লড়াই করেছেন। 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসটি তাঁর সেই অনুসন্ধিৎসু মনের এক ফসল। মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসটি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' (চণ্ডীমঙ্গল) কাব্যের একটি আধুনিক, যুক্তিনিষ্ঠ এবং মানবিক বিনির্মাণ। মহাশ্বেতা দেবী মুকুন্দরামের মধ্যযুগীয় দেবমাহাত্ম্যমূলক কাহিনিকে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রেক্ষিত থেকে দেখেছেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' বা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে লেখিকা এখানে ইতিহাসের সেইসব অবহেলিত মানুষের কথা বলেছেন, যাদের লৌকিক জীবন কাব্যের অলৌকিকতায় ঢাকা পড়েছিল। এই উপন্যাসে তিনি কেবল ইতিহাসের আদিবাসী জীবনকে তুলে ধরেননি, বরং মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত জীবন এবং কালকেতু-ফুল্লরা মিথের আড়ালে থাকা প্রকৃত শবর সমাজের লড়াইকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কেবল অভয়ামঙ্গলের রচয়িতা নন, তিনি উপন্যাসের এক রক্ত-মাংসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। লেখিকা এখানে মুকুন্দরামের এমন এক মানবিক প্রতিকৃতি এঁকেছেন, যেখানে তাঁর ব্যক্তিগত বাস্তুচ্যুতি ও শবর জীবনের প্রতি সহমর্মিতা একাকার হয়ে গেছে।

উপন্যাসের সূচনা হয় মুকুন্দরামের নিজের গ্রাম দামিন্যা ত্যাগের স্মৃতিচারণা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে এবং তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর কারাবরণের ফলে শান্ত দামিন্যা অশান্ত হয়ে ওঠে। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচার এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে মুকুন্দরাম তাঁর পৈতৃক ভিটে 'দামিন্যা' ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর এই ঘর হারানোর বেদনা ছিল অত্যন্ত গভীর—

> "ভাবতে গেলে মনে হয়, দেশ ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত তার মত মানুষ কেমন করে নিল! গাছ যেমন মাটি আঁকড়ে থাকে শিকড় দিয়ে, মুকুন্দও তো তেমনি করেই দামিন্যা আঁকড়ে বেঁচেছিল।"[৫]

পৈতৃক ভিটে ছেড়ে আসার সময় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল, তবুও সন্তানদের মুখে অন্ন জোগাতে তিনি দেশান্তরী হতে বাধ্য হন। পথিমধ্যে ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে ভেলো গ্রামে ডাকতদের কবলে পড়ে হারাতে হয় পথসম্বল। গ্রামের পথ নিঃশব্দ, দোরের পর দোর বন্ধ। তাদের করুণ আর্তিতে সাড়া দেয়নি কেউ। এদিকে পাথরের আঘাতে স্ত্রীর পা ক্ষত-বিক্ষত। মায়ের যন্ত্রণার সঙ্গী হয়েছে শিশুদের কান্না। শেষপর্যন্ত

শিশুদের আর্তনাদে বেরিয়ে এসেছিল তেলি সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ যদু কুণ্ডু। "সেই রাতে শিশু দুধ পেল, মুকুন্দরা পেল আশ্রয়।"[৬] সেখানে তিনদিন থাকার পর যদু কুণ্ডু ও তার ছেলে কবির পরিবারকে মুণ্ডেশ্বরী নদীর ঘাটে পৌঁছে দেন। পথের অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে অবশেষে তিনি বাঁকুড়া রায়ের আরড়া রাজ্যে আশ্রয় পান, যেখানে তাঁকে রাজপুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। উপন্যাসে দেখা যায়, এক নির্জন জলাশয়ের ধারে ক্লান্ত মুকুন্দরামের স্বপ্নে দেবী অভয়াচণ্ডী জন্মদাত্রী মাতা দৈবকীর ছদ্ম বেশে দেখা দেন এবং তাঁকে কাব্য রচনার আদেশ দেন। রাজার প্রাসাদে মুকুন্দ মানী গৃহস্থে পরিণত হয়। তবুও তার মনে শান্তি নেই। আসলে আরড়ায় আসার পর মায়ের স্বপ্নাদেশ মতো পাঁচালি রচনা করতে না পারার কারণে কবির মনের শান্তি বিনষ্ট হয়। কবির মনের এই দোলাচলতাকে উপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী অনিন্দ্য সুন্দর ভাষায় পরিস্ফুট করেছেন—

> "মা বলেছিল লিখবি। তালপাতায় কালির আঁচড় দেয়নি মুকুন্দ। কী লিখব, কোথা থেকে শুরু করব, তা ভাবছে। কিন্তু মন যেন তালপত্র, মন যেন মসী। সেখানে তো লেখে আর কাটে মুকুন্দ। সেখানে স-ব লেখা আছে। একটু গুছিয়ে নেবে মনটা, তারপর!"[৭]

আসলে দেবী অভয়া অর্থাৎ অরণ্যানী নিয়ে পাঁচালি লিখতে হলে তাঁর ব্যাধ বা শবর সন্তানদের রীতিকরণ তো জানা চায়– এতদিন যা ছিল কবির কাছে অজ্ঞাত।

মহাশ্বেতা দেবী মুকুন্দরামের কাব্যিক কালকেতু ও ফুল্লরাকে বাস্তবের নায়ক কাল্যা এবং নায়িকা ফুলি হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এরা কেবল কাব্যের চরিত্র নয়, বরং রক্ত-মাংসের মানুষ যারা দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং সমাজের প্রান্তিকতার শিকার। আরড়া ছাড়িয়ে চণ্ডীর বন বলে মস্ত এক জঙ্গল ছিলো। তার কিনারে থাকে আখেটিয়া ব্যাধ জাতির বংশধর কাল্যা, ফুলি, কাল্যার মা তেজটা এবং মাতামহ শবরদের প্রধান ডঙ্কা শবর। মুকুন্দরাম যখন আরড়ায় এসে দর্শকের আসনে বসে মুগ্ধ চিত্তে শবরদের দেখেন। ক্রমে পরিচিত হন শিকারী শবর সম্প্রদায়ের সরল প্রাণ মানুষ, তাদের লৌকিক দেবী অভয়া এবং প্রচলিত মিথ ও জীবনাচারণের সঙ্গে। শবরদের কাছে বনই হলো মা, আর দেবী অভয়াচণ্ডী হলেন বনের রক্ষক। মহাশ্বেতা দেবীর কাছে তিনি 'অরণ্যানী' বা বনের সামগ্রিক রক্ষক। এখানে দেবী কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপাস্য নন, বরং অরণ্য এবং তার সন্তানদের অবিচ্ছেদ্য প্রাণশক্তি। ডঙ্ক শবর এবং তাঁর মেয়ে তেজটা অরণ্যের এই প্রাচীন জ্ঞান ও ঔষধিপালার ধারক। তেজটা চরিত্রটির মাধ্যমে লেখিকা আদিবাসী নারীর প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তাকে তুলে ধরেছেন, যিনি সমাজের অনুশাসন রক্ষা করেন এবং একইসাথে অরণ্যের গভীরে থাকা আধ্যাত্মিক সংযোগ বজায় রাখেন। তেজটার কাছ থেকেই কবি জানতে পারেন রাজা কালকেতু ও ফুল্লরার লোকপ্রচলিত আখ্যান। শবরদের মধ্যে প্রচলিত লোককথা অনুযায়ী, তাদেরই এক আদিপুরুষ অভয়াচণ্ডীর কৃপায় গুজরাটের রাজা হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বা বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাদের আবার অরণ্যে ফিরে যেতে হয়। এই থেকেই ব্রাহ্মণদের প্রতি শবররা বৈরীতার মনোভাব পোষণ করে। আর এই করণেই ব্রাহ্মণ মুকুন্দের আচরণে কাল্যা মুগ্ধ হলেও অন্তরে বপন করে সন্দেহের বীজ। ফুলিকে তাদের থেকে দূরে রাখতে চাই। মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন কীভাবে শবররা আজও সেই হারানো রাজত্বের স্মৃতি বয়ে বেড়ায়। তাদের মিথ অনুযায়ী দুর্গাষ্টমীতে কোন আখেটিয়া স্বর্ণগোধা দেখে তাহলে সে হবে পরবর্তী মেঘা রাজা। মাতা তেজটা কাল্যার রাজা হওয়ার স্বপ্ন লালন করে অন্তরে। অন্যান্য শবরও কাল্যার তেজ ও বীরত্ব দেখে ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন দেখে।

কাল্যা ও ফুলি শৈশবের সঙ্গী। একে অপরকে চোখে হারায়। ফুলিকে বিয়ে করবে বলে কাল্যা দাপাদাপি শুরু করে। মাকে নির্লজ্জের মতো বলতে থাকে— "ফুলিকে বিয়া দাও, নয়তো নদীতে যেয়ে ডুবে মরব।"[৮]

পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে ডঙ্কা শবর নিজস্ব রীতি অনুযায়ী তাদের বিবাহ দেয়। কাল্যার শারীরিক গঠন ও সাহস ছিল অতুলনীয়। সে পনেরো বছর বয়সেই বাঘ মেরে রাজাকে উপহার দিয়েছিল। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "কাল্যা যে মহা শূরবীর গো! পনেরো বছর না হতে বাঘ মেরেছিল, রাজাকে দেখিয়ে নিয়ে গেল, একজোড়া কাপড়, দুটো গামছা পেল।"[৯]

কাল্যা ও ফুলির সম্পর্ক ছিল বন্য ও উদ্দাম। তাদের মধ্যে যেমন গভীর ভালোবাসা ছিল, তেমনই ছিল তীব্র সংঘাত। কাল্যা ফুলিকে চোখে হারাত, কিন্তু আবার সন্দেহের বশে তাকে প্রহারও করত। অরণ্যবাসী শবরদের ভালোবাসার গভীরতার প্রকাশ বোধ হয় এরকমই হয়।

শবরদের কাছে কোনো অলৌকিক সোনা নয়, বরং অরণ্যের পশু-পাখি আর বনজ সম্পদই ছিল বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। অভাব-অনটন এদের নিত্য সঙ্গী। শবরদের দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে— "ঘরে নাই চাষ। দুঃখ বারোমাস।" লাঙ্গলের দ্বারা মাটি কর্ষণ করে চাষের কাজ করলে ধরিত্রী মাতা ক্ষতবিক্ষত হবে বলে শবররা কখনো চাষাবাদ করে না। আসলে শবরদের জীবনের সবকিছুই অরণ্য নির্ভর। তারা জঙ্গলের পশু পাখি শিকার করে। সে শিকার করা পশুর মাংস বিক্রি করে তেল-চাল-ডাল কিনে জীবন নির্বাহ করে। কখনো কখনো পশুর চামড়া বিক্রি করে তারা শখের জিনিস কেনে। অরণ্য নির্ভর এই জনজাতির নারীদের পরিধেয় অলংকারও নানা প্রকার ফুল ও পাতা দিয়ে তৈরি। উপন্যাসের নায়ক কাল্যা সারাদিন বনে বনে পশু শিকার করে আর তার বউ ফুলি সেই পশুর মাংস বিক্রি করে উপার্জিত অর্থে অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করে। এই প্রসঙ্গে মুকুন্দ চক্রবর্তী জীবহিংসার প্রসঙ্গ তুললে কাল্যা দেবী অভয়ার পৌরাণিক ও লৌকিক রূপের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বলে—

> "তুমি আমি কি এ নিয়ম সিজেছি? অভয়াচণ্ডী তোমাদের দিয়েছে পুজো, পুঁথি, খামার, গোহাল! আমাদের দিয়েছে জঙ্গল। আমরা শবর হে, জঙ্গলের সন্তান!"[১০]

কাল্যার দুর্ধর্ষ রূপ ও সরলতা দেখে তিনি মনে মনে ভাবতেন—

> "কী খায়! এমন স্বাস্থ্য হয় কী করে! কী পরে? এমন রাজার মতো মাথা তুলে চলে যায় কী করে? আনসমাজের মানুষ সব অন্যরকম...শবরদের জীবন এমন অকলুষ থাকে কী করে?"[১১]

পেটে ভাত নেই, মাথায় তেল নেই, পরনে কাপড় নেই কিন্তু তাদের জীবনে রস আছে। কবি শবরদের অকলুষ ও স্বাভাবিক জীবন দেখে অভিভূত হন।

কাল্যার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজমান। নগরের আগ্রাসনে ও নগর জীবনের জৌলুসের প্রভাবে শবররা যাতে নিজস্বতা না হারিয়ে ফেলে এজন্য তার আচরণ হয়ে ওঠে অত্যন্ত কঠিন ও পাশবিক। আর এই কারণেই সে ফুলিকে মুকুন্দের পরিবারের সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না। মুকুন্দরামের কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যা হলো দারিদ্র্যের এক করুণ চিত্র, যেখানে অভাবই মূল উপজীব্য। মহাশ্বেতা দেবী ফুলির এই দারিদ্র্যতাকে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখেছেন। মঙ্গলকাব্যের ফুল্লরা যেখানে দৈব কৃপায় দারিদ্র্য মুক্তির স্বপ্ন দেখে, ব্যাধখণ্ডের ফুল্লরা সেখানে মাটির পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য লড়াই করে। তার বারোমাস্যা এখানে কেবল ক্ষুধার বিবরণ নয়, বরং এটি একটি বঞ্চিত জাতির টিকে থাকার দীর্ঘশ্বাস। ফুলি কেবল দুঃখী নারী নয়, সে মুকুন্দরামের স্ত্রী 'বামুনদিদি'র সাথে সখ্য গড়ে তুলেও উচ্চবর্ণের সমাজের সমান্তরালে নিজের আদিবাসী সত্তাকে টিকিয়ে রাখে। মুকুন্দরামের ফুল্লরা দেবীর কাছে দুঃখ নিবেদন করে, কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর ফুলি বোঝে যে এই অভাব জাগতিক অবিচারের ফল। ফুলি মুকুন্দরামের স্ত্রীকে তার জীবনের অভাবের কথা বলতে গিয়ে বলে– "অভয়া যেমন মাপায়। তেমন হবে তো? তোমাদের মাপিয়েছে, তোমরা নিত্য অন্ন খাও, ঘরে থাক। শবররা তার সন্তান বটি, কিন্তু আমাদের মাপায়নি গো! সকলের মাপায়নি!"[১২] ফুলি জানত শবর হওয়ার কারণে

তারা সভ্য জগতের অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই উপন্যাসে ফুল্লরা চরিত্রটি কেবল অভাবের প্রতীক নয়, বরং সে শবর কুলের অস্তিত্ব রক্ষার এক নিভৃত শক্তি। ফুল্লরার মাধ্যমে মহাশ্বেতা দেবী প্রান্তিক নারীদের সেই রূপটি এঁকেছেন, যারা ঘর এবং বাহির-উভয় ক্ষেত্রেই অস্তিত্ব রক্ষার চূড়ান্ত মূল্য চোকায়।

মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতু হলো ইন্দ্রের পুত্র 'নীলাম্বর', যে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে ব্যাধরূপে জন্মেছে। সেখানে চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু স্বর্ণগোধিকা (সোনালী গোসাপ) পায় এবং রাতারাতি বিত্তবান হয়ে গুজরাট নগর পত্তন করে। অর্থাৎ, পুরো বিষয়টি অলৌকিক ও দৈবনির্ভর। মহাশ্বেতা দেবী এই অলৌকিকতাকে বর্জন করেছেন। তাঁর উপন্যাসে কাল্যা (কালকেতু) ও ফুলি (ফুল্লরা) রক্ত-মাংসের মানুষ। তিনি দেখিয়েছেন, শবরদের কাছে কোনো অলৌকিক সোনা নয়, বরং অরণ্যের সম্পদ এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিই প্রধান। এখানে 'অভয়াচণ্ডী' কোনো মূর্তি নন, বরং অরণ্যের রুদ্র ও বরাভয় রূপের প্রতীক। শবরদের জীবন দর্শনে দেবীর রূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাল্যা কবির উদ্দেশ্যে বলে— "অভয়া! অভয় দেয়— সকলেরে। বন বল, জানোয়ার বল, পাখি বল, শবর বল, সকলেরে অভয় দিয়ে আগুলে রাখে। এ বড় রহস্য কথা গো ঠাকুর!"[১৩] শবরদের বিশ্বাসে দেবী অরণ্যের সকল প্রাণীকে আগলে রাখেন। উপন্যাসে দেবী অভয়াচণ্ডী কেবল একটি ধর্মীয় বিগ্রহ নন, তিনি অরণ্য-প্রকৃতি এবং প্রান্তিক শবর জাতির জীবন-দর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য প্রতীক। মুকুন্দরামের কাব্যে যেখানে তিনি অলৌকিক সৌভাগ্যদাত্রী, উপন্যাসে তিনি সেখানে অরণ্যের ভারসাম্য রক্ষাকারী এক পরম সত্তা। উপন্যাসে দেবী অভয়াচণ্ডীকে 'দেবী অরণ্যানী' হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি কেবল মানুষের নন, বরং অরণ্যের প্রতিটি প্রাণীর আশ্রয়স্থল। দেবী এখানে অরণ্যের ভারসাম্য রক্ষা করেন এবং অকারণে পশুবধ বা অরণ্য বিনাশ করলে তাঁর অভিশাপ নেমে আসে। কাল্যার পিতা মেঘা যখন একটি গর্ভিণী হরিণ মেরেছিলেন, তখন তিনি দলপতি হওয়ার অধিকার হারিয়েছিলেন, কারণ সেটি ছিল অভয়ার দৃষ্টিতে 'মহাপাপ'। মুকুন্দরামের কালকেতু এক আদর্শ বীর, যে ব্যাধ হয়েও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুগামী হতে চায় এবং শেষ পর্যন্ত রাজা হয়। মহাশ্বেতা দেবীর কাল্যা অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি। শিকারি হিসেবে দক্ষ হলেও সে মূলত এক শোষিত আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি।

শবরদের নিজস্ব সমাজব্যবস্থা ও ন্যায়বোধ মূলস্রোতের হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা। কাল্যার ট্র্যাজেডি এই যে, সে অরণ্যের নিয়ম ভাঙতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে হারিয়ে ফেলে। শবরদের কাছে কালকেতু তাদের আদিপুরুষ এবং তারা বিশ্বাস করে দুর্গাষ্টমীতে স্বর্ণগোধা শিকার করা অত্যন্ত ভাগ্যের ব্যাপার। এটি তাদের দেবী অভয়ার কৃপা পাওয়ার একটি মাধ্যম। এই স্বর্ণগোধার কাহিনি আসলে শবরদের হারানো আত্মসম্মান ফিরে পাওয়ার লড়াই। শবরদের কাছে স্বর্ণগোধা কেবল সোনা নয়, বরং এটি তাদের হারানো আত্মসম্মান ফিরে পাওয়ার চাবিকাঠি। কাল্যা ভেবেছিল এই বিশাল ঐরাবত মারতে পারলে সে স্বর্ণগোধাও পাবে এবং কালকেতু রাজা হতে পারবে। সে দেবীর কৃপাকে কেবল বীরত্বের মাপকাঠিতে বিচার করতে চেয়েছিল। কাল্যা অরণ্যের শাশ্বত নিয়ম লঙ্ঘন করে ঐরাবত শিকারে মত্ত হয়, যা তার বিনাশ ডেকে আনে। কাল্যা যখন অরণ্যের গহন অন্ধকারে ঐরাবতের মুখোমুখি হয়, তখন তার ঘাম আর রক্তের গন্ধে হাতিটি উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কাল্যার অন্তিম মুহূর্তের বর্ণনায় বলা হয়েছে— "ঐরাবতের বৃংহণ ও কাল্যার করুণ আর্তনাদ বন ছাড়িয়ে অনেক, অনেক দূরে চলে যায়।"[১৪] কাল্যার করুণ মৃত্যু এবং তার দেহের ওপর ঐরাবতের আছাড় দেওয়া আসলে অভয়ার অরণ্য-নিয়ম লঙ্ঘনের এক নির্মম পরিণতি। কাল্যার মৃত্যু এবং ফুলির আত্মবিসর্জন শবর সমাজের এক চরম বিপন্নতাকে নির্দেশ করে। ফুলির আত্মবিসর্জনের চিত্রটি অত্যন্ত করুণ—

> "জলে ভাসছিল নিরাবরণ ফুলি। শাড়ির দু'মোড়ায় পা বাঁধা, হাত বাঁধা, শাড়ির খোঁট ফুলির দাঁতে। দাঁতে চিপে টেনে টেনে কেমন করে ফুলি হাত বেঁধেছিল কে জানে।"[১৫]

এই মৃত্যু কেবল একটি শোকের ঘটনা নয়, বরং অরণ্য ও নগরের যুদ্ধে পরাজিত এক সংস্কৃতির শেষ দীর্ঘশ্বাস। আসলে কাল্যা ও ফুলির মৃত্যু দৃশ্যের রূপকে ঔপন্যাসিক নগর সভ্যতার নিষ্ঠুর আগ্রাসনে ও আধুনিকতার আবরণে অরণ্যভূমিকে গ্রাস করার প্রসঙ্গটি পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবীর নির্মাণে দেবী অভয়াচণ্ডী হলেন সেই আদিম জননী, যিনি সভ্যতার আগ্রাসনে ব্যথিত হন এবং তাঁর সন্তানদের নিয়ে অজানা অরণ্যে পাড়ি দেন–

> "না, তার অমৃতগন্ধা খোঁজা হবে না আর। শবরদের সত্বর আরড়ানগরীর দূরপ্রান্ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। যেমন শবররা যায় চিরকাল, চিরকাল। আর শবর জীবনের এ দেশান্তরী পর্বে ডঙ্ককেই নেতৃত্ব দিত হবে, একা তেজটা পারবে না। মল্লভূম, ধলভূম, বরাভূম, মানভূম কোথাও অন্য এক কুমারী অরণ্য নিশ্চয় রেখেছে অভয়া। নিশ্চয় এমন জায়গা আছে। যেখানে নগর নেই, বাজার নেই, রাজা নেই, আনজাতি নেই। আছে শুধু অরণ্য, জল, পাহাড়।"[১৬]

আসলে শবর জীবনের চিরন্তন অমোঘ নিয়তি হল, 'নগর আগায়, শবর পালায়'।

মুকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগর পত্তন করলে বনের পশুরা চণ্ডীর কাছে আশ্রয় চায়। এখানে নগর পত্তনকে মঙ্গলময় হিসেবে দেখানো হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী একে দেখেছেন আদিবাসীদের নিজস্ব ভূমি থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়ার ট্র্যাজেডি হিসেবে। তিনি দেখিয়েছেন, বন কেটে নগর তৈরি করার অর্থ হলো আদিবাসীদের ভিটেমাটি আর অরণ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া। কাব্যের কবি আর উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে সেতুবন্ধন হলো এই 'উদ্বাস্তু' হওয়ার বেদনা, যা মুকুন্দরামকে ব্যাধদের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে। নিজের গ্রাম দামিন্যা ত্যাগের যন্ত্রণা তাঁকে শবরদের যাযাবর জীবনের সাথে একাত্ম করে দেয়। শবরদের এই দেশান্তরী হওয়ার যন্ত্রণা কবি নিজেও অনুভব করেন—

> "শিলাবতীর তীরে দাঁড়িয়ে মুকুন্দ ক্ষমা চেয়েছিল মনে মনে। নগর ছড়ায়, শবর দেশত্যাগ করে। এই যখন চিরকাল হয়ে আসছে, নগরবাসী মুকুন্দর এত ছটফটানি কেন? সে তো শবরদের জানে না, সে তো শুধু দর্শক।"[১৭]

প্রজাপালনের নামে রাজার আমলাদের শোষণ ও দুর্দিনের সংকেত তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন। এই মানবিক সংযোগই তাঁর 'ব্যাধখণ্ড' রচনার মূল রসদ জোগায়। এই অরণ্য-চেতনাকেই তিনি কাব্যের আধ্যাত্মিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি স্থির করেন বাস্তব জীবনের শূরবীর 'কাল্যা'কে তিনি 'কালকেতু' এবং মমতাময়ী 'ফুলি'কে 'ফুল্লরা' হিসেবে কাব্যে স্থান দেবেন। মুকুন্দরাম তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বাস্তব জীবনে পরাজিত কাল্যাকে কাব্যের পাতায় সেই 'স্বর্ণগোধা' বা পরম সম্মান পাইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর কাব্যের মাধ্যমে শোষিত কাল্যাকে সেই আদিম মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে। মুকুন্দরামের সংকল্পে ফুটে ওঠে— "স্বর্ণগোধা তোরে দিব রে কাল্যা, কলম স—ব পারে।"[১৮] উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, কাল্যা ও ফুলির মর্মান্তিক বিদায়ের পর কবি অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে তালপাতার নতুন পুঁথি নিয়ে বসেন— "মুকুন্দ প্রথম তালপত্রে লিখল 'অভয়ামঙ্গল'। তারপর, বালির পুঁটলিতে সযত্নে কালি শুকিয়ে পাতা উলটোল। বড় বড় করে লিখল, 'ব্যাধ খণ্ড' ॥ প্রথম দিবস॥ ব্যাধ নইলে অরণ্যানীকে প্রতিষ্ঠা করবে কেমন করে? মুকুন্দ লিখতে থাকল।"[১৯] মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্য রচনার প্রেক্ষাপটটি কেবল দৈব স্বপ্নাদেশ নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের চরম সংকট, উদ্বাস্তু হওয়ার যন্ত্রণা এবং শবরদের লৌকিক জীবনকে নিবিড়ভাবে দেখার এক সম্মিলিত ফসল। মুকুন্দরামের কাব্য রচনার মূল প্রেক্ষাপট ছিল শবরদের প্রতি এই অপরাধবোধ ও তাঁদের লৌকিক জীবনকে অমর করার বাসনা।

আদিবাসীদের নিজস্ব ইতিহাস বা কথ্য পরম্পরা থাকলেও মূলস্রোতের সমাজ তা চিরকাল উপেক্ষা করে এসেছে। শবরদের 'অপরাধপ্রবণ' হিসেবে চিহ্নিত করা এবং তাদের ভূমিহীন করার ঐতিহাসিক অবিচারের বিরুদ্ধে মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাস এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের সমাজ বাস্তবতাকে দেবীর মাহাত্ম্যের আড়ালে লিখেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী সেই আড়াল সরিয়ে আদিবাসী জীবন, তাদের বঞ্চনা এবং অরণ্যের সাথে তাদের নাড়ির সম্পর্ককে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী মঙ্গলকাব্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'অভয়ামঙ্গল'-এর কালকেতু-ফুল্লরার চিরায়ত আখ্যানকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও এটি মূলত শবর জাতির বঞ্চনা ও অস্তিত্ব রক্ষার এক আধুনিক উপাখ্যান। 'অভয়ামঙ্গল'-এর কালকেতু ছিল দেবী অভয়ার আশীর্বাদপুষ্ট, কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর কালকেতু বা তার উত্তরসূরি শবররা আধুনিক শোষিত সমাজের প্রতিনিধি। যেখানে মুকুন্দরাম শেষ করেছেন দেবীর আশীর্বাদে সুখের মিলনে, মহাশ্বেতা দেবী সেখানে শেষ করেছেন শবরদের এক গভীর নিরুদ্দেশ যাত্রায় এবং মানবিক হাহাকারে। তাঁর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসটি মূলত প্রান্তিক শবর জাতির জীবনসংগ্রাম, তাঁদের বঞ্চনার ইতিহাস এবং আর্য সংস্কৃতির সাথে তাঁদের সংঘাতের এক অনন্য দলিল। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক চিরায়ত মিথকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আধুনিক রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিনির্মাণ করেছেন। প্রথাগত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা কালকেতু ও ফুল্লরার যে কাহিনি পাই, মহাশ্বেতা দেবী তাকে দৈব মহিমা থেকে মুক্ত করে ধুলো-মাটির বাস্তবতায় নামিয়ে এনেছেন।

তথ্যসূত্র:

১) দেবী, মহাশ্বেতা। 'ভূমিকার পরিবর্তে', শ্রেষ্ঠ গল্প। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৯।
২) মজুমদার, অতীন্দ্র। চর্যাপদ, নয়া প্রকাশ। কলকাতা, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৬৭, পৃ. ১৫৪।
৩) চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত)। লোককথার সাতকাহন। অপর্ণা বুকস ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ১৩৬।
৪) দেবী, মহাশ্বেতা। ব্যাধখণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৮।
৫) তদেব, পৃ. ২২।
৬) তদেব, পৃ. ৪১।
৭) তদেব, পৃ. ৩৫।
৮) তদেব, পৃ. ৬৩।
৯) তদেব, পৃ. ৫০।
১০) তদেব, পৃ. ৪৫।
১১) তদেব, পৃ. ৯৪।
১২) তদেব, পৃ. ৭১।
১৩) তদেব, পৃ. ৪৬।
১৪) তদেব, পৃ. ১১৫।
১৫) তদেব, পৃ. ১১৬।
১৬) তদেব, পৃ. ১১৭।
১৭) তদেব, পৃ. ১১৮।
১৮) তদেব, পৃ. ১২০।
১৯) তদেব, পৃ. ১২০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) দেবী মহাশ্বেতা। ব্যাধখণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪।
২) দেবী মহাশ্বেতা। 'ভূমিকার পরিবর্তে'। শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৩) মজুমদার অতীন্দ্র। চর্যাপদ। নয়া প্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৬৭।
৪) চক্রবর্তী বরুণকুমার (সম্পাদিত)। লোককথার সাতকাহন। অপর্ণা বুকস ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০।
৫) দেবী মহাশ্বেতা। শবর লোকগান ও লোককথা। সাহিত্য একাডেমী, কলকাতা, ২০১৩।
৬) মুখোপাধ্যায় সুখময়। চণ্ডীমঙ্গল-পরিক্রমা। প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮।
৭) গুপ্ত শুভেন্দু। প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২।
৮) মুখোপাধ্যায় পম্পা। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনীতি। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩।
৯) ঘোষ নির্মল। মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮।